শ্রীরামকৃষ্ণজীবন : দু-চার কথা

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন আজকের পৃথিবীর কাছে একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয়। যতই দিন যাচ্ছে, ততই এই মহাজীবনকে কেন্দ্র করে, তাঁর বাণীকে চিন্তা করতে করতে মানুষ, দেশ, সভ্যতা নিজেদের বাঁচার পথ, নিজেদের সাধনমার্গগুলিকে নতুন করে চিহ্নিত করতে পারছে। অনেকসময় মনে হয় তাঁর কথাগুলি কত সহজ! কঠিন শাস্ত্রবাক্যগুলিকে তিনি অনায়াসে গুছিয়ে দিয়েছেন। জীবনটাও যেন কত সহজ—আমরা সবাই যেন বুঝতে পারছি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছিলেন, ''অবতার অচিনে গাছ''—যাঁকে দেখে মনে হয় যেন চিনি, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখা যায় চেনাটা ঠিক ঠিক হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এই চিনতে না পারাটা বোধহয় কোনও ব্যর্থতা নয়, এটাই বোধহয় সাধনার পথ। যাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনপথ অনুসরণ করেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরতত্ত্বকে চিনতে চান, বুঝতে চান, অন্তরে উপলব্ধি করতে চান। শ্রীরামকৃষ্ণ যেহেতু অবতার, তাই তাঁকে চিহ্নিত করতে যাওয়ার চেষ্টা, বোঝার চেষ্টা, চেনার চেষ্টাতেই আমাদের এই সাধনাটি এগিয়ে চলে। শ্রীরামকৃষ্ণের একটি জীবনী লেখার জন্য গিরিশবাবু স্বামীজীকে অনুরোধ করেছিলেন। উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন, ''আমাকে ওই অনুরোধটি করবেন না, ও-কাজ ছাড়া আর যে কোনও কাজ বলবেন, আমি তাই আনন্দে করব। যদি পৃথিবী ওলটপালট করে ফেলতে বলেন, সেও আচ্ছা, কিন্তু ওই কাজটি পারব না। তিনি এত মহান ছিলেন, এত বড় ছিলেন যে আমি তাঁকে কিছুই বুঝতে পারিনি। তাঁর জীবনের এক কণাও আমি জানতে পারিনি। শেষে শিব গড়তে গিয়ে কি বানর গড়ে ফেলব? আমি তা পারব না।''

স্বয়ং বিবেকানন্দ, যাঁকে কিনা শ্রীরামকৃষ্ণ চাপরাশ দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর মিশন প্রচারের, প্রতিষ্ঠার মুখ্য যন্ত্র করে রেখে গিয়েছিলেন এই সংসারে, তিনিই যদি একথা বলেন, তবে আমাদের কা কথা! স্বামীজী তাঁর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে একবার বলেছিলেন, ''তিনি যে কী, কত কত পূর্বগ অবতারগণের জমাটবাঁধা ভাবরাজ্যের রাজা, তা জীবনপাতি তপস্যা করেও একচুল বুঝতে পারলুম না। তাঁর ভাবসমুদ্রের উচ্ছ্বাস একবিন্দু ধারণা করতে পারলে মানুষ তখনই দেবতা হয়ে যায়। সর্বভাবের এমন সমন্বয় জগতের ইতিহাসে আর কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায়?... অবতার বললে তাঁকে ছোট করা হয়।''

বিখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের পাঠকেরা জানেন যে, এই উক্তি তাঁর সম্পর্কে সেকালের এক বৈষ্ণব সাধক করেছিলেন। বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সেখান থেকেই এসেছেন, যেখান থেকে সমস্ত অবতারগণের উৎপত্তি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অবতারত্ব তাই আমাদের পক্ষে বোঝা অত সহজ নয়। কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করাটাই আমাদের সাধনা। স্বামীজী তাঁর একটি চমৎকার বন্দনামন্ত্রে বলেছেন, ''প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধিনং বেদোদধিং মথিত্বা/ দত্তং যস্য প্রকরণে হরিহরব্রহ্মাদিদেবৈর্বলম্।/ পূর্ণং যত্তু প্রাণসারৈ-র্ভৌমনারায়ণানাং/ রামকৃষ্ণস্তনুং ধত্তে তৎপূর্ণপাত্রমিদং ভোঃ॥" অর্থাৎ অনাদি অনন্ত বেদরূপ সমুদ্র মন্থন করে যা পাওয়া গেছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রমুখ দেবতা যাতে শক্তিসঞ্চার করেছেন, অবতারদের প্রাণরসে পূর্ণ সেই অমৃতের পূর্ণপাত্ররূপে শ্রীরামকৃষ্ণ দেহধারণ করেছেন। এই কারণেই বোধহয় আজ যখন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন আমরা আলোচনা করতে যাই, তখন একদিকে যেমন বুঝতে পারি যে এই জীবনের মধ্যে যুগান্তরের নতুন নতুন ভাবনাগুলিকে বুঝতে পারার সামর্থ্য রয়েছে, ঠিক তেমনি অনেকে আবার এই জীবনটিকে বুঝতে গিয়ে ভুলও করে বসেন। কিছুদিন আগে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় গবেষক-অধ্যাপককে বলতে শুনলাম, শ্রীরামকৃষ্ণ বেঁচে থাকবেন একজন সাধক হিসেবে যিনি ঊনবিংশ শতকে আবির্ভূত হয়ে সেই সময়টাকে প্রভাবিত করেছেন; তবে আজকের এই পরিবর্তিত যুগে সেই প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে। এতেই বোঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের কথাটি কতখানি সত্য যে অচিনে গাছকে সহজে চেনা যায় না। তাঁকে দেখে মনে হতে পারে তিনি আমাদের কাছে অত্যন্ত সহজ সরল, কিন্তু যদি গভীর সাধনায় তাঁকে বোঝার চেষ্টা না করা হয় তবে এইধরনের ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। গীতার উপোদ্ঘাত- ভাষ্যে আচার্য শংকর বলেছেন কেন অবতারের আবির্ভাব প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যখনই ধর্ম পরাভূত হয় এবং অধর্ম প্রবর্ধমান হয়, তখনই এই ধর্মরক্ষার জন্য আসেন অবতার। রামানুজাচার্য গীতায় অবতারতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে ভারি সুন্দর দেখিয়েছেন যে অবতার আসলে কেউ নন, স্বয়ং পরব্রহ্ম—পুরুষোত্তম। তিনি বলেছেন, ''পরিপূর্ণ- নিখিলজগদুদয়বিভবলয়লীন-পরব্রহ্ম-পুরুষোত্তম-নারায়ণো ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তমখিলং জগৎ সৃষ্ট্বা লোকেষু অবতীর্য অবতীর্য তৈস্তৈরা-রাধিতস্তত্তদভীষ্টানুরূপং ধর্মার্থকামমোক্ষফলং প্রযচ্ছতি।" অবতারপুরুষই সেই মুখ্যতত্ত্ব, জগতের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হন। এযুগে এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন। এমন একটা প্রয়োজন পড়েছে, যেটা অতীতের সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপিয়ে চলে যাচ্ছে। কোনও ভুল নেই, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে এই দেশ এবং পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ ও সভ্যতা প্রভূত পরিমাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজবিদ্যা, ইতিহাস ও সাহিত্যে নানান উন্নতি, নানান গবেষণা প্রত্যক্ষ করেছে। উন্নত হয়েছে জ্ঞানচর্চার জগৎ, আমাদের জীবনযাপনের যাবতীয় প্রকরণ ও পদ্ধতি। কিন্তু তার সঙ্গে এটাও সত্য, যত দিন যাচ্ছে ততই আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের অন্তরের ক্ষুধাবোধ বেড়েই চলেছে। এতদিন আর্থিক দারিদ্র্য মোচনের জন্য আমরা নানাভাবে চেষ্টা করেছি। ধর্ম চেষ্টা করেছে, রাষ্ট্র চেষ্টা করেছে, ব্যক্তি চেষ্টা করেছে। আজ সেই আর্থিক বা শারীরিক দারিদ্র্য নিঃসন্দেহে অনেক কমে গেছে। কিন্তু তার স্থান নিয়েছে অপর একটি দারিদ্র্য—মানসিক দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য দূর করার সামর্থ্য আজ পর্যন্ত আবির্ভূত কোনও সামাজিক বা ঐতিহাসিক তত্ত্বে দেখা যাচ্ছে না। আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখব মানুষে মানুষে সংঘাত, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অবিশ্বাস যে-পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে,

ইতিহাস তা কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। আমাদের যাবতীয় গবেষণা, যাবতীয় সামাজিক আন্দোলন, ঐতিহাসিক চর্চা—অনেক চেষ্টা করেও এই অন্তরের দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না। ধ্রুব আদর্শগুলিকে ভেঙে দিতে চাইছে আধুনিক বা উত্তর-আধুনিক ভাবনাগুলি। কিন্তু তারাই প্রশ্ন করছে—আজ আমাদের অস্তিত্বের মূল্য কোথায়? তারাই ভেবে পাচ্ছে না, কেন বাঁচতে চাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ এই সময়ের বুকের উপর দাঁড়িয়ে মানুষের জীবনের কাছে এই উত্তরটাই দিতে এসেছিলেন। আমরা দেখি অবতারেরা অসুর বধ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণেরও আগমন একটি অসুর বধের জন্য। সংশয়ই সেই অসুর। স্বামীজী লিখেছেন, ''সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রম্/ যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যম্।'' একালের দার্শনিক বলছেন, ''I doubt so I exist''—আমি সংশয় করি, অতএব আমার অস্তিত্ব রয়েছে। মানুষের অস্তিত্বের মূলে যদি সংশয় থাকে তাহলে তার পরিণতি অবিশ্বাসে, ঈর্ষায়, হিংসায়, পারস্পরিক হানাহানিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সংশয়রাক্ষসকে বধ করবার জন্যই এসেছেন—তাঁর উপলব্ধি নিয়ে, তাঁর সরল অথচ গভীর জীবনানুভব নিয়ে; এবং এইখানেই তাঁর অবতারত্ব যুগপ্রয়োজনকে মিটিয়ে যুগান্তরে যাত্রা করছে। আজকের পৃথিবীর মানুষ যখন শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে তাকায় তখন ঊনবিংশ শতাব্দীর নগর কলকাতার উপকণ্ঠে থাকা এক উপলব্ধিবান সাধকের দিকে তাকায় না, তারা খুঁজে পায় এই যুগে দাঁড়িয়ে তাদের জীবনসমস্যার সমাধানকারী একজন আশ্রয়পুরুষকে। স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ বলেছিলেন, ''ঠাকুর যে ঈশ্বর সেকথা এখন যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি। কত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই না তাঁর ভেতর রয়েছে! তাঁর সাধনায় শাস্ত্রোক্ত সাধনপথগুলি যেন আবার পরীক্ষিত হয়েছে, যুগোপযোগী হয়েছে। তাঁরই মধ্যে সমন্বিত হয়েছে জ্ঞান, ভক্তি, ধ্যান, কর্মের পরাকাষ্ঠা।'' শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন এজন্যই আজকের সংশয়ী মানুষের কাছে, অস্তিত্বে অবিশ্বাসী মানুষের কাছে, আজকের এই ভালবাসাহীন হিংসা-আঘাতে জর্জরিত মানুষের কাছে একটি স্বতন্ত্র দর্শনরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, হচ্ছে। কিন্তু এও ঠিক, একটি চমৎকার পরিকাঠামোরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনের একটি সুন্দর অবয়ব এখনও পরিপূর্ণভাবে তৈরি হতে বাকি আছে। নিশ্চয়ই সময় আসবে, সেটিও তৈরি হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীকার স্বামী সারদানন্দজী 'লীলাপ্রসঙ্গ' লিখে গিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনের সূত্রগুলি পাওয়ার জন্য এটি একটি শ্রুতিগ্রন্থ। শ্রীম কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতও আর একটি শ্রুতিগ্রন্থস্বরূপ। নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থগুলি থেকেই পাওয়া যাবে শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনের এক-একটি উপাদান। ওই যে অত্যন্ত সহজ ভাষায় লেখা আছে—''চোখ বুজলেই তিনি আছেন, আর চোখ খুললেই নেই?'' ''মত পথ।'' লীলাপ্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অসাধারণ অনুভূতি 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ''শালগ্রাম থেকে মানুষ বড়।''—এই এক-একটি কথা যেন রামকৃষ্ণদর্শনের এক-একটি সূত্র। আমরা প্রাচীন ভারতে অনেক দর্শনসূত্রগ্রন্থ দেখেছি। ব্রহ্মসূত্র তৈরি হয়েছে বেদান্তদর্শনের প্রতিষ্ঠাগ্রন্থ-রূপে। ধর্মসূত্র তৈরি হয়েছে পূর্বমীমাংসাদর্শনের প্রতিষ্ঠাগ্রন্থরূপে। তারপর সেই সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করে তৈরি হয়েছে অগণিত দর্শন। এই প্রতিটি দর্শন আধ্যাত্মিক জীবনজিজ্ঞাসার সমাধান। বিগত হাজার হাজার বছর ধরে শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর বহু সভ্যতাকে তার প্রাণরস জুগিয়ে এসেছে এই আধ্যাত্মিক ভারতীয় দর্শনগুলি। এই সমস্ত ভারতীয় দর্শনের সারাৎসার সংকলিত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতভূমিতে আবির্ভূত এই রামকৃষ্ণ-

জীবনের মধ্যেই। তিনিই হয়ে উঠেছেন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন, স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র। তিনি নিজেই বলেছেন যে তাঁর অনুভূতি বেদবেদান্তকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। আসলে অবতারপুরুষ স্বয়ং শাস্ত্র। তাঁর মুখের কথা শাস্ত্রবচন। অতীতে আমরা সংস্কৃতে শাস্ত্রবাক্য পড়ে এসেছি। এবার একটি দেশীয় ভাষায় যেন শাস্ত্রবাক্য রচিত হচ্ছে। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় সূত্রে বলা হয়েছে, 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।' দুভাবে একে ব্যাখ্যা করেছেন আচার্য শংকর। এক, শাস্ত্রসমূহ সেই ব্রহ্মতত্ত্ব—মোক্ষতত্ত্ব থেকেই নির্গত হয়েছে। আবার বিপরীতে শাস্ত্রসমূহই এই মুখ্য ব্রহ্মতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করছে, উপস্থাপিত করছে। এইদিক থেকে দেখতে গেলে শাস্ত্র যেন স্বয়ং হয়ে উঠছে ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণই এযুগের সেই 'শাস্ত্রযোনি', এযুগের শাস্ত্র-উৎস। শ্রীরামকৃষ্ণ থেকেই আগামী পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে তৈরি হওয়া শাস্ত্রবাক্যসমূহ নথিবদ্ধ হয়েছে, উপলব্ধ হয়েছে, ব্যাখ্যাত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে আহ্বান করেছিলেন এই জগতকে। বলেছিলেন, নবযুগ পরিবর্তনের কাল উপস্থিত হয়েছে। আমরা যেন সেই কালপরিবর্তনের চেষ্টায় সমবেত হই। পুরীধামে জগন্নাথের রথযাত্রা উৎসব সম্পর্কে বলা হয়, জগন্নাথের রথ আপনিই এগিয়ে চলে। যারা সেই রথের রশি স্পর্শ করতে পারে, তারা ধন্য হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-রথচক্র যুগপরিবর্তনের পথে মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আমরা যারা সেই রথের রশি স্পর্শ করতে পারব, সেই মহাযুগচক্র পরিবর্তনের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারব, তারা ধন্য হয়ে যাব। স্বামীজী একটি কবিতায় ভারি সুন্দর লিখেছেন :

''চল প্রভু, চল তব বাধাহীন পথে ততদিন—
যতদিন ওই তব মাধ্যন্দিন প্রখর প্রভায়
প্লাবিত না হয় বিশ্ব, পৃথিবীর প্রতি দেশে দেশে
সেই আলো না হয় ফলিত, যতদিন নরনারী
তুলি উচ্চ শির—নাহি দেখে টুটেছে শৃঙ্খলভার—
না জানে শিহরানন্দে তাহাদের জীবন নূতন।''

স্বামীজী বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে—তিনি আমাদের সঙ্গে যেন চলেন। এই যুগপরিবর্তনে তিনিই আমাদের সারথি। শ্রীরামকৃষ্ণের এক আধুনিক জীবনীকার রিচার্ড শিফম্যান লিখছেন, কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে তিনি দেখেছেন প্রত্যেকটি জায়গায় যেন শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্ন আঁকা রয়েছে। মজা করে বলছেন, বাসের পেছনে রামকৃষ্ণনাম লেখা, দোকানের নাম শ্রীরামকৃষ্ণের নামে, একটা রিকশাভ্যান—তাতেও লেখা 'রামকৃষ্ণ'। শিফম্যান লিখছেন, ''বুঝতে পারছি এই জাতিটার সংস্কৃতির প্রতিটি অণুতে পরমাণুতে এই মহামানব অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন।'' ওই গ্রন্থের শেষে তিনি লিখছেন—শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথা উদ্ধৃত করে—বাউলের দল এল গেল, নাচলে গাইলে, কেউ চিনলে, কেউ চিনলে না। তাঁর কালে এমনটাই হয়েছিল। কিন্তু এই অন্ধকার যুগ যখন আলোর দিকে যেতে চাইবে, তখন এই 'অবতারবরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণকে চিনতেই হবে। সেই চেনাটাই আমাদের সাধনা। সেই সাধনার সাধক হওয়াটাই আমাদের কাছে একমাত্র ব্রত। আমরা দুর্গাপূজার শেষে বলি, ''ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবিতং মম।/ আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরি মমাশ্রমম্॥''—আমার জীবন ধন্য, আমার যাবতীয় জীবনচর্যা সার্থক, কারণ তুমি আমার গৃহে এসেছ। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের এই গৃহে এসেছেন—আমাদের এই দেশে, এই জীবনে। আজকের এই পুণ্যলগ্নে যেন তাঁকে এইটুকু বলতে পারি : ''ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবিতং মম।'' আমাদের জীবন ধন্য, কৃতকৃতার্থ কারণ তিনি আমাদের কাছে এসেছেন। সেটুকু যেন বলতে পারি—তাঁর চরণে এইটুকুই আমাদের প্রার্থনা।